শাস্ত্র বিরোধিতা বাঙালির ঐতিহ্য ঃ আজও স্বাধীন চিন্তাতেই তার আগ্রহ

অশোক কুমার রায়

দশ এগারো বছর আগে সলমন রুশদির মৃত্যু - পরোয়ানা নিয়ে কিছু সংখ্যক আন্তর্জাতিক জহ্লাদ যখন প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান রুশদি আপন নিরাপত্তা নিয়ে ছিলেন শঙ্কিত, তখন বিশ্বখ্যাত জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, ''রুশদি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা, —তামাম দুনিয়ার সমস্ত লেখক তোমার সমর্থনে একাত্ম, মানুষের বিবেককে কোন শক্তিও হত্যা করতে পারে না।

জানি না, বাংলাদেশের লেখিকা নাসরিনের উদ্দেশ্যে এমন কোন উদ্দীপ্ত বাণী কোন লেখক উচ্চারণ করেছেন কিনা— পশ্চিম বাংলা থেকে বা ভারতের অন্য কোন রাজ্য থেকে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ থেকে। তাঁর অপরাধও রুশদির মতই— আপাতদৃষ্টিতে কিছু শাস্ত্রবিরোধী অভিমত ব্যক্ত করা। কিন্তু তিনি কোরাণ পুনর্লিখনের দাবী জানিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তিনি বলেছেন বেদ - কোরাণের বিধানের বাইরে আধুনিক মন এবং দৃষ্টি নিয়ে ভবিষ্যৎ মানব জীবনের প্রতি তাকাতে এই যুক্তিবহ বক্তব্য শুনেই। ওই দেশের বেশ কিছু সংখ্যক ধর্মান্ধ মোল্লা তাঁর মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে প্রমত্ততার এক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে আজ দীর্ঘদিন নাসরিনের অস্তিত্ব বিপন্ন। তাঁর রচনার গুণাগুণ বিচার এক্ষেত্রে অবান্তর; যা' একান্ত প্রাসঙ্গিক তা হল, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার জন্য একজন মানুষ কেন এমন অযৌক্তিকভাবে নিগৃহীত ও তাড়িত হবেন? তাঁর বিবেককে হত্যা করার কেন এই ষড়যন্ত্র?

যুক্তিসিদ্ধ জীবনচর্চায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা এই সমস্যায় বিচলিত ও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না। বিশেষ করে উভয় বাংলার ভাবুক বাঙালীদের কাছে এ সমস্যা একটা নূতন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তসলিমার প্রতি সমর্থনে সরব হওয়া এ কারণে নয় যে তিনি অতিশয় সাহসিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন; এ কারণেও নয় যে তিনি ইদানীং দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে অভিনব মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে এ কারণে যে তিনি কথা বলেছেন শ্বাশত বঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, এবং সেই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করার অভিপ্রায়ে। তাঁকে কেন্দ্র করে এ 'যাবৎ যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তাতে সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অজ অত্যন্ত জরুরী, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বঙ্গদেশের ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ শাস্ত্র বিরোধিতা। একথা তো সকলেরই জানা, বঙ্গদেশে আর্যীকরণ সহজ হয়নি বলে অথবা প্রতিহত হয়েছিল বলে উত্তর ভারতীয়রা বাঙালীদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। পাপ দেশ, পাণ্ডববর্জিত দেশ ইত্যাদি ধরণের গালমন্দ করে তারা শাস্ত্রের বিধান না মানা বঙ্গদেশের নিন্দা করেছে এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে। এ সময়ে বঙ্গদেশ মগধাদি প্রদেশের সঙ্গে যৌথ পরিবারভূক্ত ছিল; আশ্চর্যের বিষয, সেই সময় এই যৌথ অস্তিত্বে, কাছাকাছি এলাকায়ই জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি যাগযজ্ঞ বিরোধী মতবাদ প্রবর্তিত হয়, ব্যাপকতা লাভ করে। আরও একটি উল্লেখনীয় বিষয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা কপিল মুনির আশ্রম ছিল গঙ্গা সাগর সঙ্গমে। গঙ্গা সাগর তো বঙ্গদেশেরই ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত। এই যুক্তিতে আচার্য ক্ষিতি মোহন সেন শাস্ত্রী একদা মন্তব্য করেছিলেন, সাংখ্যমতের বিস্তারে বঙ্গদেশের কি কোন দাবী নেই? এ থেকে বাঙালীদের সারস্বত অবেদানের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়; তা হ'ল স্বাধীন শাস্ত্রবিরোধী চিন্তা। এবং এই মনোভঙ্গির জন্যই বঙ্গ দেশের পণ্ডিতগণ এক সময়ে সুখ্যাতি অথবা কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সেই স্বাধীনচিন্তা বাঙালীর মানস জগতে ফল্গু ধারার মতো বহমান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভঙ্গি তে কথাটা ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে, ''নদীর পলিমাটিতে তৈরী এই বঙ্গ ভূমি। এখানে ভূমি উর্বর। বীজ মাঠেই এখানে সজীব ফসল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবী আছে। ... কিন্তু তাই বলে এ দেশের সাধনাকে পুরকালের পাথরের জগদ্দল চাপে কঠিন ও ভারগ্রস্থ করে রাখলে তো চলবে না। মানবপন্থী বঙ্গদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ - নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত হত। তার মানে বঙ্গদেশ চিরদিনই প্রবল ছিল। তখন মগধও ছিল বাংলার সঙ্গেই একঘরে অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে। বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যে দেখা যায় সেই স্বাধীনতা। তাদের সাহিত্যে ও গায়ে অলঙ্কার বা শাস্ত্রে গুরুভার তারা কখনও সইতে পারেনি। শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই অথচ কি গভীর কি উদার তার ব্যঞ্জনা।''

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারার মধেও এই শাস্ত্রবিরোধীতার ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। এর সূচনা চর্যাপদের কাল থেকে—ঐ পদগুলির মধ্যে নিহিত বৌদ্ধতান্ত্রিক-সহজিয়া সাধকদের বিদ্রোহ অবক্ষয়ী ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি লৌকিক আর্যেতর জীবনের সম্মান ও স্বীকৃতি; প্রত্যক্ষ করি পৌরানিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদর্শে অঙ্কিত মনোধর্মী শিল্পের বিরুদ্ধে প্রাণধর্মী শক্তির বিরুদ্ধে। আর, বিদ্রোহের ফসলতায় ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের অন্তরে লৌকিক ভাবাদর্শের স্থান লাভ। চৈতন্যদেব ও তাঁর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্মতো ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার বিরুদ্ধে— শাস্ত্র বিরোধিতার এক মূর্ত প্রতীক, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শাস্ত্রীয় বিধির বাইরে বিচরণের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার জোরেই মানুষ আপন মনুষ্যত্বে স্থিত থাকে, শক্তিমান হয়।

তারপরে উনবিংশ শতাব্দীতে। পশ্চিমের যুক্তিবাদী চিন্তার সংস্পর্শে যে নবজাগরণ, সাহিত্যে - সমাজে-মননশীলতায়, তার নায়কদের মধ্যেও শাস্ত্রবিরোধিতার অকুতোভয় অভিযান; শতাব্দীর শুরু থেকে শেষ অবধি দুর্বার গতিতে প্রবাহিত। এমন যে বঙ্কিমচন্দ্র যিনি সনাতন পন্থী, রক্ষণশীল বলে অধিকাংশ মানুষের কাছে ভুলক্রমে চিহ্নিত হয়ে আছেন, তাঁর মধ্যেও শাস্ত্রবিরোধিতা ছিল। তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ-গীতা যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন প্রচলিত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তিনি কিভাবে খন্ডন করেছেন। যুক্তিসিদ্ধ মননশীলতায় তিনি কতটা আত্মস্থ ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ এখানে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে। 'মনুসংহিতা' জলে স্নান

পানাদি করে, তাহা নষ্ট করিবে। যে হিন্দু ধর্মে তৃষিতকে এক গণ্ডুষ জলদানের অপেক্ষা আর পূণ্য নাই বলে, সেই হিন্দুধর্মেরই এই গ্রন্থ বলিতেছে যে সহস্র সহস্র লোককে জল পিপাসা পীড়িত করিয়া প্রাণে মারিবে। এটা কি হিন্দুধর্ম? যদি হয়, তবে এরূপ নৃশংস ধর্মের পুনর্জ্জীবনে কি ফল?...স্থূল কথা এই, মনুতে যাহা কিছু আছে তাহাই ধর্ম নহে।"

''ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ''দান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, এই জন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থা, এরূপ দানকে ধর্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধন দান করার অর্থ—মূল্য দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দানকে ধর্ম বলা ধর্মে অবমাননা।' এমনিভাবে শাস্ত্রবিরোধী মনোভঙ্গি ও যুক্তিবাদী মানসিকতার সহায়তায় তিনি বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করে গেছেন, অথচ, বিস্ময়ের বিষয়, বঙ্কিম সমালোচকদের মনোযোগ এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয়েনি।

যাইহোক বঙ্কিমচন্দ্রের পর, বিংশ শতাব্দীতে অশাস্ত্রীয় মনস্কতার পটভূমি স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। শতাব্দী, তৃতীয় দশকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', প্রধানতঃ কাজী আবদুল ওদুদের প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে। ওই সংস্থার অন্বিষ্ঠ ছিল বুদ্ধির মুক্তি— শাস্ত্রীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি থেকে সংস্কার ও বিশ্বাসের অন্ধতা থেকে মুক্তি। প্রথম দিকে শিক্ষিত মুসলমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র - অধ্যাপকদের মধ্যে সাড়াও পড়েছিল বিপুল। কিন্তু অল্প কিছুদিন বাদেই এলো আঘাত, ধর্মান্ধ রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে সাহিত্য সমাজের অধিবেশন বসত; কিন্তু তিনটি অধিবেশনের পর আর অধিবেশন করতে দেওয়া হল না। শোনা যায় ওদুদের জীবনও বিপন্ন হয়েছিল। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন প্রতিহত হল। সেই সময়ের কিছু পরে ওদুদ 'সম্মোহিত মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ ও সমস্তের গভীরতার যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে সে তাকায় সুধু সন্দিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে— এর কোলে যেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, একে যেন সে চেনে না। মুসলমানের, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমানের এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলতে চাই— সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয়, সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতার চরম দশা বলা যেতে পারে— তার মানব সুলভ সমস্ত বিচার বুদ্ধি, সমস্ত মানস উৎকর্ষ আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত। ...তার জন্যে একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও 'ঠিক নয়', শাস্ত্রবচনের পিছনে যে সত্য ও শ্রেয়ঃ-অন্বেষী মানচিত্তের স্পন্দন এর অপূর্বতা রয়েছে বলে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য উপলব্ধির সেই দ্বার তার কাছে রুদ্ধ। প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম — স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্র ব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম। সেই প্রভুর হুকুমে কখনো কখনো 'প্যান ইসলাম' -এর স্বপ্ন, কখনো এই তেরশত বৎসরের আগেকার শরীয়তের হুবহু প্রবর্তনার স্বপ্ন।"

তাঁর আমলের সম্মোহিত মুসলমানদের দাপটে পরাস্ত হলেও ওদুদ শাস্ত্রবিরোধী সাধনা, বুদ্ধিকে মুক্ত করার সাধনা, পরিত্যাগ করেননি। আজীবন সে সাধনা অমলিন রেখে ছিলেন এবং বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সংযোজন করেছেন নতুন মাত্রা। সেই মাত্রায় ছিল অন্ধতা থেকে মুক্তি এবং মানবিক শ্রেয়বোধের প্রসন্নতা। ওই প্রবন্ধেই ওদুদ বলেছিলেন, ''আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের মানুষ বহুকাল ধরে দুঃস্বপ্নে কাটিয়েছে—এমন দুঃস্বপ্ন দেখা মানুষের ইতিহাসে নতুন নয়— নিজেদের শুধু হিন্দু ও মুসলমান এই দুইভাগে ভাগ করে দেখা সেই দুঃস্বপ্নেরই জের টেনে চলা। আমরা শুধু হিন্দু ও মুসলমান নই— আমরা মানুষ। সেই মানুষের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত সুখ, অনন্ত রূপ। সে আজ আমাদের সামনে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ রূপে এসেছে, মহাপ্রেমিক রূপে এসেছে, হিন্দু - মুসলমান - খ্রীষ্টান রূপে এসেছে। কিন্তু এই তার চরম অভিব্যক্তি নয়, ইতিহাসের ধারা এইখানে এসেই থেমে যায়নি। মানুষের নব নব দুঃখ, নব নব সুখ, নব নব কালের পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের সামনে উদঘাটিত হচ্ছে। সে সমস্তের দিকে যদি আমরা না তাকাই...তবে শুধু এই পরিচয়ই দেওয়া হবে যে আমরা অন্ধ। আর অন্ধ চিরদিনই হাতড়ে হাতড়ে ধাক্কা খেয়ে চলে, অল্প সময়ের জন্যও বুক ফুলিয়ে রাজপথ দিয়ে চলার অধিকার তার নেই।"

এই প্রত্যয় যেমন নির্মল, বিশুদ্ধ, তেমনি বলিষ্ঠ। সম্মোহিত মুসলমান সেই প্রত্যয় গ্রহণ করেনি, কিন্তু তাতে উদ্দীপ্ত হওয়ার মতো লোকের অভাব তাঁর আমলে যেমন ছিল না, তেমনি এখনও নেই। তার প্রমাণ তসলিমা নাসরিন। তিনি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। আর তার পিছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের শাশ্বত বঙ্গের সাংস্কৃতির ঐতিহ্য, শাস্ত্র বিরোধিতা যার অন্যতম অঙ্গীকার। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলে জীবনের রস শুকিয়ে যায়, ভবিষ্যৎ ও নতুন নতুন সৃষ্টিশীলতার প্রেরণা নিয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীমানসে উন্মেষিত হয় না। ফলে, সংস্কৃতির বিবর্ধনও স্তব্ধ হয়ে যায়।

শাস্ত্র বচনের পুনর্বিচারের দাবি জানিয়ে তসলিমা যে বক্তব্য রেখেছেন, কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর পূর্ব উল্লেখিত প্রবন্ধের প্রেক্ষিত থেকে তা শুধু যথার্থ নয়, সময়োচিত। তা'তে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের যেমন সাক্ষর, তেমনি সাক্ষর রূপান্তরশীল বিশ্ব সম্পর্কে প্রবুদ্ধবোধ। আগেই বলা হয়েছে, তসলিমার সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর, তেমনি অপ্রয়োজনীয় তাঁর রাজনৈতিক অভিমতের সংকেত গ্রহণ। বর্তমান প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তিনি বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে স্থিত রয়েছেন এবং সেই অঙ্গীকারই তাঁর কণ্ঠকে আশ্রয় করে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তাই এই বঙ্গ সংস্কৃতির শাস্ত্র বিরোধী অঙ্গীকারকে নির্মূল করার জন্য রণসজ্জায় প্রমত্ত, রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি করে তাদের উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত দিয়ে বলতে হয়; বিনিপাত। গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-যমুনা অবিশ্রান্ত ধারায় সাগর সঙ্গমের দিকে বয়ে যাক।